আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বনু কুরাইযাহর যুদ্ধ (غَزْوَةُ بَنِيْ قُرَيْظَةَ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

বনু কুরাইযাহর যুদ্ধ

খন্দকের যুদ্ধ প্রান্তর থেকে যেদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যাবর্তন করলেন সে দিন যুহরের সময় যখন তিনি উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর গৃহে গোসল করছিলেন তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং বললেন, ‘আপনি কি অস্ত্রশস্ত্র খুলে রেখে দিয়েছেন? ফিরিশতাগণ কিন্তু এখনো অস্ত্রশস্ত্র খোলেন নি। আমিও শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে সরাসরি এখানেই চলে আসছি। উঠুন এবং স্বীয় সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বনু কুরাইযাহ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকুন। আমি অগ্রভাগে গিয়ে তাদের দূর্গসমূহে কম্পন সৃষ্টি করে তাদের অন্তরে ভয় ভীতির সঞ্চার করে দিব।’ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–কে এ সকল কথা বলার পর জিবরাঈল (আঃ) ফিরিশতাগণের দলভুক্ত হয়ে যাত্রা করলেন।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন যে যাঁরা শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর দন্ডায়মান আছেন তাঁরা আসরের সালাত পড়বেন বনু কুরাইযাহ গিয়ে। এরপর ইবনু উম্মু মাকতুম (রাঃ)-এর উপর মদীনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং আলী (রাঃ)-এর হাতে যুদ্ধের পতাকা দিয়ে বুন কুরাইযাহ অভিমুখে প্রেরণ করলেন। যখন তিনি বনু কুরাইযাহর দূর্গসমূহের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন তারা তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর উপর গালিগালাজের বৃষ্টি বর্ষণ করছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুহাজিরীন ও আনসারদের একটি সুসংগঠিত দল নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং বনু কুরাইযাহর ‘আন্না’ নামক এক কূপের পাশে অবতরণ করলেন। অন্যান্য সাধারণ মুসলিমগণও যুদ্ধের ঘোষণা শুনে দ্রুতগতিতে বনু কুরাইযা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে আসর সালাতের সময় হয়ে গেল। তখন কেউ কেউ বললেন, ‘আমাদের যেভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে আমরা সেই ভাবেই কাজ করব। আমরা বনু কুরাইযাহয় গিয়ে আসর সালাত আদায় করব।’ এ কারণে কেউ কেউ এশার পর আসর সালাত আদায় করেন।

কিন্তু কোন কোন সাহাবা এ কথাও বলেন, ‘নাবী কারীম (ﷺ)–এর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, সালাতের ব্যাপারে আমরা অন্য মত কিংবা পথ অবলম্বন করি। বরং তিনি এটাই চেয়েছিলেন যে, বিলম্ব না করে আমরা যেন বনু কুরাইযাহর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। যাঁরা এ ধারণা পোষণ করেছিলেন তাঁরা পথেই সময় মতো আসর সালাত আদায় করে নিয়েছিলেন। তবে ব্যাপারটি যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর নিকট পেশ করা হয় তখন তিনি এ প্রসঙ্গে কোন পক্ষকেই ভাল-মন্দ কোন কিছুই বলেন নি।

যে প্রকারেই হোক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মুসলিম সৈন্যদল বনু কুরাইযাহ ভূমিতে গিয়ে পৌঁছলেন এবং নাবী কারীম (ﷺ)–এর সঙ্গে মিলিত হলেন। অতঃপর বনু কুরাইযাহর দূর্গসমূহকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললেন। মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার এবং অশ্বের সংখ্যা ছিল ত্রিশটি।

বনু কুরাইযাহর ইহুদীগণ যখন আঁটঘাট অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে নিপতিত হল তখন ইহুদী নেতা কা'ব বিন আসাদ তাদের সামনে তিনটি পরিবর্তনশীল প্রস্তাব উপস্থাপন করল। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

1. হয় ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দ্বীনে প্রবেশ করে স্বীয় জানমাল এবং সন্তান সন্ততির ধ্বংস প্রাপ্তি থেকে রক্ষা করবে, এ প্রস্তাব উপস্থাপন কালে কা‘ব বিন আসাদ এ কথাও বলেছিল যে, ‘আল্লাহর শপথ! তোমাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি হচ্ছেন প্রকৃতই একজন নাবী এবং রাসূল। অধিকন্তু তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা স্বীয় আল্লাহর কিতাবে অবগত হয়েছ।’
2. অথবা স্বীয় সন্তান সন্ততিগণকে স্বহস্তে হত্যা করবে। অতঃপর তলোয়ার উত্তোলন করে নাবী (ﷺ)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করবে। পরিণামে হয় আমরা বিজয়ী হব, নতুবা সমূলে নিঃশেষ হয়ে যাব।
3. অথবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবা কেরাম (ﷺ)-কে ধোঁকা দিয়ে শনিবার দিবস তাঁদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করবে। কারণ এ ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকবেন যে, এ দিবসে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হবে না।

কিন্তু ইহুদীগণ এ তিনটি প্রস্তাবের একটিও মঞ্জুর করল না। তার ফলে কা‘ব বিন আসাদ রাগান্বিত হয়ে বলল, ‘মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করার পর তোমরা কেউই একটি রাতও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অতিবাহিত করনি।

এ প্রস্তাব তিনটি প্রত্যাখ্যানের পর বনু কুরাইযাহর সামনে শুধুমাত্র যে পথটি অবশিষ্ট রইল তা হল, তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করে আত্মসমর্পণ করবে এবং আপন ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেবে। কিন্তু তারা আরও ভেবে চিন্তে স্থির করল যে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে অর্থাৎ অস্ত্র সমর্পণের পূর্বে তাদের সঙ্গে সাহায্য চুক্তিতে আবদ্ধ মুসলিমগণের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে। সম্ভবত এর মাধ্যমে অস্ত্র ত্যাগের ফলাফল সম্পর্কে তারা কিছুটা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে।

এ প্রেক্ষিতে তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এ মর্মে প্রস্তাব পাঠাল যে, ‘আবূ লুবাবাকে তাদের নিকট প্রেরণ করা হোক।’ যেহেতু আবূ লুবাবার সঙ্গে তারা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল সেহেতু তার সঙ্গে তাদের পরামর্শ করা প্রয়োজন। অধিকন্তু আবূ লুবাবার বাগ-বাগিচা, সন্তান-সন্ততি এবং গোত্রীয় লোকেরা ছিল সেই অঞ্চলেরই বাসিন্দা।

যখন আবূ লুবাবা সেখানে উপস্থিত হল তখন পুরুষগণ তাকে দেখে দৌঁড়ে তার নিকট এল এবং শিশু ও মহিলাগণ করুন কণ্ঠে ক্রন্দন শুরু করল। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আবূ লুবাবার অন্তরে ভাবাবেগের সৃষ্টি হল। ইহুদীগণ বলল, ‘আবূ লুবাবা! আপনি কি যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন যে, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করি?’

বলল, ‘হ্যাঁ’, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাত দ্বারা কণ্ঠনালির দিকে ইঙ্গিত করল, যার অর্থ ছিল হত্যা। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে সে উপলব্ধি করল যে, ব্যাপারটি হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সুস্পষ্ট খিয়ানত। এ কারণে সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন না করে সরাসরি মসজিদে নাবাবীতে গিয়ে উপস্থিত হল এবং নিজেই নিজেকে মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে শপথ করল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বহস্তে তাকে না খোলা পর্যন্ত সে এ অবস্থাতেই থাকবে এবং আগামীতে কোন দিন বনু কুরাইযাহর ভূমিত প্রবেশ করবে না। এদিকে তার প্রত্যাবর্তনে বিলম্বিত হওয়ার ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছিলেন। অতঃপর তিনি প্রকৃত ব্যাপারটি অবগত হয়ে বললেন,

(أَمَا إِنَّهُ لَوْ جَاءَنِيْ لَاَسْتَغْفَرْتُ لُهُ، أَمَا إِذْ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ فَمَا أَنَا بِالَّذِيْ أَطْلَقَهُ مِنْ مَكَانِهِ حِتّٰى يَتُوْبَ اللهَ عَلَيْهِ)

‘যদি সে আমার নিকট আসত তাহলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। কিন্তু যেহেতু সে নিজের মতকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেই এ কাজ করে বসেছে সেহেতু আল্লাহ তা‘আলা যতক্ষণ তার তওবা কবুল না করছেন ততক্ষণ আমি তাকে বন্ধন মুক্ত করতে পারব না।’

এদিকে আবূ লুবাবার কূটকৌশল জনিত গোপন ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও বনু কুরাইযা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট অস্ত্র সমর্পণ করারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং তিনি যা উপযুক্ত বিবেচনা করবেন তা তারা নির্বিবাদে মেনে নেবে বলে স্থির করল। অথচ দীর্ঘকাল যাবৎ এ অবরোধের ধকল সহ্য করার মতো সামর্থ্য ও সহনশীলতা বুন কুরাইযাহর ছিল। কারণ এক দিকে যেমন তাদের নিকট প্রচুর খাদ্য ও পানীয় মজুদ ছিল, পানির ঝরণা এবং কূপ ছিল অন্যদিকে তেমনি মজবুত ও সুসংরক্ষিত দূর্গও ছিল। পক্ষান্তরে মুসলিমগণকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে রক্ত জমাটকারী শীত ও ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল এবং খন্দক যুদ্ধের প্রথমাবস্থা থেকেই অবিরাম যুদ্ধ ব্যস্ততার মধ্যে থাকার দরুন ক্লান্তির ও অবসাদের অন্ত ছিল না। কিন্তু বনু কুরাইযাহর যুদ্ধ ছিল প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক বিদ্বেষ প্রসূত এক বিরোধমূলক ব্যাপার। আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছিলেন, এর ফলে তাদের যুদ্ধোন্মাদনা এবং উদ্যম ক্রমেই স্তিমিত হয়ে পড়ছিল। তাদের ক্রমবিলীয়মান এ উদ্যম ঐ সময় শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছিল যখন আলী ইবনু আবূ ত্বালিব এবং জোবায়ের বিন ‘আউওয়াম (রাঃ) তাদের দূর্গ তোরণের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং আলী (রাঃ) বজ্র নিনাদে ঘোষণা করলেন যে, ‘আল্লাহর সেনাগণ! আল্লাহ শপথ! আমি হয় সেই অমৃতের পেয়ালা থেকে পান করব যা হামযাহ করেছে আর না হয় এটা সুনিশ্চিত যে, এ দূর্গ জয় করব।’

আলী (রাঃ)-এর এ প্রাণপণ সংকল্পের কথা অবগত হয়ে বনু কুরাইযা তড়িঘড়ি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সমীপে নিজেদের সমর্পণ করে দিল যাতে তিনি তাদের জন্য যা সঙ্গত বলে বিবেচনা করবেন এরূপ একটি পন্থা অবলম্বন করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পুরুষদের বন্দী করার নির্দেশ প্রদান করায় মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আনসারীর তত্ত্বাবধানে বনু কুরাইযাহর সকল পুরুষ লোককে বন্দী করা হল এবং মহিলা, শিশু ও অক্ষম পুরুষদের সযত্নে পৃথকভাবে রাখা হল। আওস গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ বলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আবেদন পেশ করল যে, ‘বনু ক্বায়নুক্বা’ গোত্রের সঙ্গে আপনি যে আচরণ করেছেন তা আপনিই উত্তমরূপে অবগত আছেন। আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে, ‘বনু ক্বায়নুক্বা’ গোত্র আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের হালীফ ছিলেন এবং এ সকল লোকজন আমাদের হালীফ আছেন। অতএব অনুগ্রহ করে তাদের উপর ইহসান করুন।’

নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(أَلَا تَرْضُوْنَ أَنْ يَّحْكُمَ فِيْهِمْ رَجُلٍ مِّنْكُمْ؟)

‘আপনারা কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন যে, আপনাদেরই এক ব্যক্তি তাদের সম্পর্কে মীমাংসা করে দেবেন? তারা জবাব দিল,

(فَذٰكَ إِلٰى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ)

‘এমনটি হলে আমাদের সন্তুষ্ট না হওয়ার কোনই কারণ নেই।’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘ভালো কথা, এ ব্যাপারটি সা‘দ বিন মু’আয এর দায়িত্বে রইল।’

তারা বলল, 'আমরা এর উপর সন্তুষ্ট আছি।'

অতঃপর সা'দ বিন মু'আযকে ডেকে পাঠানো হল। তিনি তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন। সৈন্যদের সঙ্গে বনু কুরাইযায় আগমন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ, খন্দকের যুদ্ধে তাঁর হাতের শিরা কর্তিত হওয়ার ফলে তিনি আহত হয়েছিলেন। তাঁকে একটি গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে হাজির করা হয়। যখন তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন গোত্রীয় লোকজন চতুর্দিকে থেকে তাঁকে ঘিরে ধরে বলতে থাকলেন, 'হে সা'দ! স্বীয় হালীফদের সাথে উত্তম ও কল্যাণকর মীমাংসা করবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপনাকে এ জন্যই বিচারক নির্বাচিত করেছেন যে, আপনি তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন। কিন্তু তিনি তাদের কথার উত্তর না দিয়ে চুপচাপ রইলেন। কিন্তু লোকজন এ ব্যাপারে তাঁকে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকলেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি বললেন, 'এখন এমন এক সময় সমাগত যখন সা'দ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কোন নিন্দুকের নিন্দার চিন্তা কিংবা ভয় করেন না। এ কথা শোনার পর কিছু লোক মদীনায় আসে এবং বন্দীদের মৃত্যু অনিবার্য বলে ঘোষণা করে।

এরপর সা'দ (রাঃ) যখন নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি ইরশাদ করলেন, (قُوْمُوْا إِلٰى سَيِّدِكُمْ) 'তোমরা উঠে তোমাদের নেতার দিকে এগিয়ে যাও।' যখন তাঁকে অবতরণ করিয়ে আনা হল তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেন, 'হে সা'দ! এ সব লোকজন আপনার মীমাংসার উপর আস্থাশীল হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।'

সা'দ বললেন, 'আমার মীমাংসা কি এদের উপর প্রযোজ্য হবে?'

জবাবে লোকেরা বলল, 'জী হ্যাঁ'।

তিনি বললেন, 'মুসলিমগণের উপরেও কি?'

লোকেরা বলল, 'জী হ্যাঁ'।

তিনি আবারও বললেন, 'এখানে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন তাদের উপরেও কি তা প্রযোজ্য হবে?' তাঁর ইঙ্গিত ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)'র অবতরণ স্থানের দিকে, কিন্তু সম্মান ও ইজ্জতের কারণে মুখমণ্ডল ছিল অন্যদিকে ফেরানো।

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ, আমার উপরেও হবে।'

সা'দ বললেন, 'তাহলে তাদের সম্পর্কে আমার বিচারের রায় হচ্ছে এই যে, পুরুষদের হত্যা করা হোক, মহিলা ও শিশুদের বন্দী করে রাখা হোক এবং সম্পদসমূহ বন্টন করে দেয়া হোক।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ) 'আপনি তাদের ব্যাপারে ঠিক সেই বিচারই করেছেন যেমনটি করেছেন আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপর।'

সা'দের এ বিচার ছিল অত্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক। কারণ, বনু কুরাইযা মুসলিমগণের জীবন মরণের জন্য অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে যা করতে চেয়েছিলেন তা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিভীষিকাময়। অঙ্গীকার ভঙ্গের একটি জঘন্য অপরাধও তারা করেছিল। অধিকন্তু, মুসলিমগণকে নিঃশেষ করে ফেলার জন্য তারা দেড় হাজার তরবারী, দুই হাজার বর্শা, যুদ্ধে ব্যবহারোপযোগী তিন শত লৌহবর্ম এবং পাঁচ শত প্রতিরক্ষা ঢাল সংগ্রহ করে রেখেছিল। পরবর্তী কালে সেগুলো মুসলিমগণের অধিকারে আসে।

এ সিদ্ধান্তের পর রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর নির্দেশে বনু কুরাইযাহ গোত্রের লোকজনকে মদীনায় এনে বনু

নাজ্জার গোত্রের হারেসের কন্যার বাড়িতে তাদের আবদ্ধ করে রাখা হয়। অতঃপর মদীনার বাজারে একটি পরিখা খনন করে বন্দীদের এক একটি দলকে সেখানে নিয়ে গিয়ে শিরঃচ্ছেদ করা হয়। এহেন অবস্থায় নিপতিত অবশিষ্ট কিংকর্তব্যবিমূঢ় বন্দীগণ যখন স্বীয় নেতা কা‘ব বিন আসাদের নিকট জানতে চাইল যে, ‘যাদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হচ্ছে।’

সে বলল, ‘এতটুকু উপলব্ধি করার মতো সাধারণ বোধও কি তোমাদের নেই। তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, যাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারা আর ফিরে আসছে না। কোন অনুরোধকারীর অনুরোধ রক্ষা করা হচ্ছে না। আল্লাহর শপথ! হত্যা ব্যতিরেকে আর কিছুই হচ্ছে না।’

এভাবে বন্দীদের সকলের (যাদের সংখ্যা ছয় এবং সাত শতের মধ্যবর্তী ছিল) শিরচ্ছেদ করা হয়।

উল্লেখিত ব্যবস্থাপনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিপক্ক অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বনু কুরাইযাহর বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটন করে ফেলা হয়। মুসলিমগণকে নিঃশেষ করে ফেলার উদ্দেশ্যে তাঁদের দুঃখ দুর্দশা ও দারুন দুঃসময়ে শত্রুদের সাহায্য দান করে তারা যে জঘন্য যুদ্ধ অপরাধ করেছিল তাতে তারা যথার্থই প্রাণদন্ড পাওয়ার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল।

বনু কুরাইযাহর ন্যায় বনু নাযীর গোত্রের নিকৃষ্ট শয়তান ও আহযাব যুদ্ধের বড় অপরাধী হুয়াই বিন আখতাবও তার নানা অন্যায় অত্যাচারের কারণে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েছিল। এ ব্যক্তি উম্মুল মু’মিনীন সাফিয়্যাহ (রাঃ)-এর পিতা ছিল। কুরাইশ এবং গাত্বাফানদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যখন বনু কুরাইযাকে অবরোধ করা হয় এবং তারা দূর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে থাকে তখন বনু কুরাইযাহর সঙ্গে হুয়াই বিন আখতাবও দূর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে। কারণ, আহযাব যুদ্ধের সময় এ ব্যক্তি যখন কা‘ব বিন আসাদকে বিশ্বাসঘাতকতা ও গাদ্দারী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এসেছিল তখন সে অঙ্গীকার করেছিল তখন চলছিল সে অঙ্গীকারেরই বাস্তবায়ন।

তাকে যখন খিদমতে নাবাবীতে নিয়ে আসা হল তখন সে এক জোড়া পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রেখেছিল। এ পোষাককে সে নিজেই প্রত্যেক দিক থেকে এক এক আঙ্গুল করে চিরে রেখেছিল যাতে তাকে লুণ্ঠিত মালামালের মধ্যে গণ্য করা না হয়। তার হাত দুটি গ্রীবার পেছন দিকে দড়ি দ্বারা একত্রে বাঁধা অবস্থায় ছিল। সে রাসূলে কারীম (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলল, ‘আমি আপনার শত্রুতার জন্য নিজে নিজেকে নিন্দা করি নি। কিন্তু যে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করে সে পরাজিত হয়।’

অতঃপর লোকজনকে সম্বোধন করে বলল, ‘ওহে লোকেরা, আল্লাহর ফায়সালায় কোন অসুবিধা নেই। এটাতো ভাগ্যের লিখিত ব্যাপার। এটি হচ্ছে এক বড় হত্যাকান্ড যা বনু ইসরাইলের উপর আল্লাহ তা‘আলা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।’ এরপর সে বসে পড়ল এবং তার গলা কেটে দেয়া হল।

এ ঘটনায় বনু কুরাইযাহর এক মহিলাকেও হত্যা করা হয়। সে খাল্লাদ বিন সুযাইদ (রাঃ)-এর উপর যাঁতার একটি পাট নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করেছিল। তাই এ হত্যাকান্ডের প্রতিদান হিসেবেই তাকে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশ প্রদান করেন যে, যাদের নাভির নিম্নদেশের লোম গজিয়েছে তাদের হত্যা করা হোক। আতিয়া কুরাযীর তখনো সে লোম গজায়নি যার ফলে তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয়। পরবর্তী কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে অন্যতম সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

সাবেত বিন ক্বায়স যুবাইর বিন বাতা এবং তার পরিবারবর্গকে তাঁকে হেবা করে (দান) দেওয়ার জন্য আবেদন পেশ করেন। এর কারণ হল, যুবাইর সাবেতের উপর কিছু ইহসান করেছিল। তার আবেদন মঞ্জুর করে যুবাইর এবং তার পরিবারবর্গকে তাকে দিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর সাবিত বিন ক্বায়স যুবাইরকে বলেন যে, ‘রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তোমাকে এবং তোমার পরিবারবর্গকে আমার অনুরোধ আমাকে দিয়ে দিয়েছেন।

এখন আমি সকলকে তোমার হাওয়ালা বা জিম্মার প্রদান করছি। (অর্থাৎ তুমি তোমার পরিবার পরিজনসহ মুক্ত)। কিন্তু যুবাইর বিন বাতা যখন জানতে পারল যে তার গোত্রীয় সকলকেই হত্যা করা হয়েছে তখন সে বলল, ‘সাবেত তোমার উপর আমি যে ইহসান করেছিলাম তাকেই মাধ্যম করে আমি বলছি যে, তুমিও আমার উপর একটু ইহসান করো অর্থাৎ আমার গোত্রীয় ভাইদের ভাগ্যে যা ঘটেছে আমার ভাগ্যেও তাই ঘটতে দাও। এ প্রেক্ষিতে তার শিরোচ্ছেদ করে তাকেও তার গোত্রীয় ইহুদী ভাইদের দলভুক্ত করে দেয়া হয়। তবে সাবিত যুবাইর বিন বাতার সন্তান আব্দুর রহমানকে হত্যার হাত থেকে রক্ষা করেন। পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করে তিনি সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেন।

অনুরূপভাবে বনু নাজ্জারের একজন মহিলা উম্মুল মুনযির সালামাহ বিনতে ক্বায়স আরজী পেশ করল যে, সামওয়াল কুরাযীর সন্তান রিফাআ’হকে তাঁর জন্য হেবা করা হোক। তাঁর আরজী গ্রহণ করে রিফাআ’হকে তাঁর নিকট সমর্পণ করা হয়। এভাবে রিফাআ’হকে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। পরে রিফাআ’হ ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেন।

বনু কুরাইযাহর আরও কিছু সংখ্যক লোক অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপণ ও আত্মসমর্পণের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই, তাদের জীবন, ধনসম্পদ ও সন্তানাদি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। এ রাত্রিতেই ‘আমর বিন সা’দী নামক এক ব্যক্তি যে বনু কুরাইযাহর অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ না করে দূর্গ থেকে বাহির হয়ে যায়। প্রহরীদের কমান্ডার মুহাম্মাদ বিন মসলামা তাকে দেখে চিনতে পারেন এবং ছেড়ে দেন। পরে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

রাসূলে কারীম (ﷺ) বনু কুরাইযাহর ধন সম্পদের এক পঞ্চমাংশ বাহির করে নিয়ে বন্টন করে দেন। ঘোড়সওয়ারদের তিন অংশ প্রদান করেন। এক অংশ আরোহীদের জন্য এবং দু’ অংশ ঘোড়াগুলোর জন্য। যাঁরা পদব্রজে গমন করেছিলেন তাঁদের এক অংশ প্রদান করেন। কয়েদী এবং শিশুদেরকে সা‘দ বিন যায়দ আনসারীর তত্ত্বাবধানে নাজ্দ দেশে প্রেরণ করে তাদের বিনিময়ে ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে নেয়া হয়।

রাসূলে কারীম (ﷺ) বনু কুরাইযাহর মহিলাদের মধ্য থেকে রায়হানা বিনতে ‘আমর বিন খানাফাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা হতে নাবী (ﷺ)’র ওফাত প্রাপ্তি পর্যন্ত রায়হানা তাঁর মালিকানাতেই ছিলেন।[1] কিন্তু কালবীর বর্ণনামতে নাবী কারীম (ﷺ) ৬ষ্ঠ হিজরীতে তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পরে বিদায় হজ্জ্ব পালন শেষে যখন তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর মৃত্যু হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে কবরস্থ করেন।[2]

বনু কুরাইযাহ গোত্রের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলীর যখন চূড়ান্ত সমাধান হয়ে গেল তখন সৎ বান্দা সা‘দ বিন মু‘আযের যে প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশের সময় এসে গেল যার উল্লেখ আহযাব যুদ্ধের আলোচনায় এসেছে। তাই তার ক্ষত বিদীর্ণ হয়ে গেল। ঐ সময় তিনি মসজিদে নাবাবীতে অবস্থান করছিলেন। নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর জন্য মসজিদেই শিবির স্থাপন করে দিয়েছিলেন যাতে নিকটে থেকেই তাঁর সেবা শুশ্রূষা

করা যায়। ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর বিবরণ সূত্রে জানা যায় যে, তাঁর বিদীর্ণ ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। মসজিদে বনু গেফার গোত্রের লোকজনের কয়েকটি শিবিরও ছিল। যেহেতু তাদের দিকে রক্ত বয়ে যাচ্ছিল তারা দেখে বলল, ‘ওহে শিবির ওয়ালা! এগুলো কী যা তোমাদের দিক থেকে আমাদের দিক বয়ে আসছে? তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, সা’দের ক্ষতস্থান হতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। অতঃপর তিনি এ আহত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।[3]

বুখারী এবং মুসলিম শরীফে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল কারীম (ﷺ) ইরশাদ করলেন,

(اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ)

সা‘দ বিন মু’আয (রাঃ)-এর মৃত্যুতে আল্লাহ তা‘আলার আরশ কেঁপে উঠল।[4] ইমাম তিরমিযী আনাস হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং যা বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছেন যে, যখন সা‘দ বিন মু’আয (রাঃ)-এর জানাযা উঠানো হল তখন মুনাফিক্বগণ বলল, ‘এর লাশ কতই না হালকা। রাসূল কারীম (ﷺ) বললেন,

(إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ)

‘আল্লাহর ফিরিশতাগণ তাঁর লাশ উত্তোলন করেছিলেন।[5]

বনু কুরাইযাহর অবরোধ কালে একজন মুসলিম শহীদ হন। তাঁর নাম ছিল খাল্লাদ বিন সুওয়াইদ। তিনি ছিলেন সে সাহাবী যাঁর উপর বনু কুরায়যার এক স্ত্রীলোক যাঁতার একটি পাট নিক্ষেপ করেছিল। এছাড়া হযরত উকাশার ভাই আবূ সিনান বিন মিহসান এ অবরোধকালে মৃত্যু বরণ করেন।

যতদূর জানা যায় আবূ লুবাবা ছয় রাত্রি পর্যন্ত খুঁটির সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় সময় অতিবাহিত করেন। প্রত্যেকবার সালাতের সময় তাঁর স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিত। সালাত শেষে পুনরায় তিনি খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলতেন। অতঃপর প্রত্যুষে তাঁর তওবা কবুল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর ওহী নাযিল হয়। সে সময় নাবী কারীম (ﷺ) উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। আবূ লুবাবা বর্ণনা করেন যে, উম্মু সালামাহ আপন গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, ‘হে আবূ লুবাবা! শুভ সংবাদ, সন্তুষ্ট হয়ে যাও আল্লাহ তা‘আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। এ কথা শ্রবণ করে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) তাঁর বাঁধন খুলে দেয়ার জন্য দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু রাসূল কারীম (ﷺ) ছাড়া অন্য কারো হাতে বাঁধন খুলে নিতে তিনি অস্বীকার করলেন। তাই ফজরের সালাতের জন্য বাহির হয়ে নাবী কারীম (ﷺ) যখন সেখানে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর বাঁধন খুলে দেন।

এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় যূল ক্বা’দাহ মাসে।[6] পঁচিশ দিন পর্যন্ত বনু কুরাইযাহর অবরোধ স্থায়ী থাকে। সূরাহ আহযাবে আল্লাহ তা‘আলা খন্দকের যুদ্ধ এবং বনু কুরাইযাহর যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং এ দু’ যুদ্ধের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেন। মু’মিন ও মুনাফিক্বদের বিভিন্ন অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ এতে পাওয়া যায়। সূরাহ আহযাবের এ বিষয় সংশ্লিষ্ট আয়াতে কারীমাসমূহে শত্রুদের বিভিন্ন দলের ভাঙ্গন ও উদ্যমহীনতা এবং আহলে কিতাবের অঙ্গীকার ভঙ্গের ফলাফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়।

ফুটনোট

[1] ইবনু হিশাম ২য় খন্ড ২৪৫ পৃঃ।

[2] তালকিহুল ফহুম ১২ পৃঃ।

[3] সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৫৯১ পৃঃ।

[4] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৫৩৬ পৃ: সহীহুল মসলিম ২য় খন্ড ২৯৪ পৃঃ, এবং জামে তিরমিযী ২য় খন্ড ২২৫ পৃঃ।

[5] জামে তিরমিযী ২য় খন্ড ২২৫ পৃঃ।

[6] ইবনু হিশাম, ২য় খন্ড ২৩৮ পৃঃ, যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দ্র: ইবনু হিশাম ২য় খন্ড ২৩৬-২৩৭ পৃঃ। সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৫৯১ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ২য় খন্ড।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6295

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন